এই শীতে.....শৈশবে !

রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়

ছোটবেলায় পড়েছিলাম একটা ছোট্ট সুন্দর কথা, 'শীত যবে আসে দোরে, বসন্ত কি থাকে দূরে ?' (If winter comes, can spring be far behind ?) যেদিন তার ঠিকঠাক অর্থটা বুঝিয়ে দেওয়া হল, ভারী অবাক হয়েছিলাম, এখানে শীত মানে নাকি খারাপ সময়, দুঃখের সময় ! এও কি হয় ? কারণ আমাদের সেই আলো-আঁধারি ছোটবেলায় শীতকালটা সব দিক দিয়েই ভারী আমোদের সময় ছিল।

কে না জানে শৈশবে সব কিছুই ভীষণ আশ্চর্য থাকে ? প্রচন্ড গরম কমে গিয়ে আকাশ থেকে অঝোরে জল ঝরল তারপর আবার ঝকঝকে রোদ্দুর উঠল অথচ সেইরকম গরম আর লাগছে না এইটা দেখেই এক সময়ে ভয়ানক অবাক হয়ে যেতাম । রোদ্দুরের তেজ কমতে কমতে যখন বেশ আরামদায়ক হয়ে উঠেছে আর ওদিকে বিকেলটা আস্তে আস্তে ছোট হতে হতে যখন পাঁচটায় এসে দাঁড়িয়েছে, তখনই একদিন সকালে স্নান করতে গিয়ে চমকে উঠলাম । আরে, নারকেল তেলের শিশির মধ্যে এই শক্ত সাদা জিনিসটা কি, এটা এর মধ্যে এলই বা কি করে ? মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলাম উনুনের পাশে রেখে দিতেই সেই সাদা বস্তুটা কেমন আস্তে আস্তে বদলে গেল সেই চিরচেনা স্বচ্ছ নারকেল তেলের চেহারায় । সে এক আশ্চর্য অনুভব, একমুহূর্তে যেন বুঝে ফেললাম আমার চারপাশে কতকিছু ঘটে যাচ্ছে, অজান্তে !

সেই থেকে আমার কাছে শীতকাল বললেই আর সব কিছু ছাপিয়ে যে ছবিটা ভেসে আসে তা হল শিশির মধ্যে জমে যাওয়া নারকেল তেল আর এক বালিকার বিস্ফারিত দৃষ্টি। জাপানীরা যেমন সাকুরা বা চেরী ফুল না ফুটলে বসন্ত এসেছে বলে স্বীকার করেন না, আমি তেমনি নারকেল তেল না জমলে শীত এসেছে বলে মানি না। কিন্তু তাই বলে যে আমার ছোটবেলায় শীত বলতে অন্য কিছু ছিল না, তা ভাবলে ভুল হবে। বরং মফস্বলে বড়ো হওয়া আমার ছোটবেলায় শীত বেশ জাঁকিয়েই আসত, অনেকদিনের জন্য। যে বছর পুজো একটু দেরীতে পড়ত, সেবার ভাইফোঁটার দিন সকালেই আমাদের সোয়েটার পরিয়ে দেওয়া হত, নতুন জামার ওপর পুরোনো সোয়েটার পরার ব্যাপারটায় আমাদের ঘোর আপত্তি থাকলেও তাতে বিশেষ লাভ হতো না। সোয়েটার পরতেই হত, সে নারকেল তেল জমুক বা না জমুক । আর তারপর থেকেই সোয়েটার শরীরের অঙ্গ হয়ে থাকত পরের কয়েকটা মাস ধরে ।

হ্যাঁ, আমার ছোটবেলার শীতকালের স্মৃতির সঙ্গে সোয়েটারের অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে হাতে নিবিড়ভাবে। শীতের শুরুতেই বিশাল বোঁচকা কাঁধে নিয়ে চলে আসত উলের ফেরিওয়ালারা । তারা অদ্ভুত একটা সুরে হাঁক দিত, আর অবাক হয়ে দেখতাম তাদের ঝোলায় কতরঙের উল ! সরু উল, মোটা উল, 'ফোর প্লাই', 'সিক্স প্লাই', উলের কত রকমফের । বেশ জবরদস্ত দরদামের পর ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়ে সেইসব উল অবিলম্বেই লাছি থেকে গোলায় রূপ পেয়ে যেত। তারপর শীতের উজ্জ্বল দুপুর জুড়ে ছাদ থেকে ছাদে, বারান্দায়, উঠোনে রোদ্দুর পিঠে নিয়ে মা-মাসী-পিসিদের জমজমাট আসরে কটা সোজা, কটা উল্টো, কত নম্বর কাঁটা, আটনম্বর না দশনম্বর, গোল গলা না ভি গলা, গলাবন্ধ না সামনে চেরা, এইসব বিচিত্র পরিভাষায় গুরুগম্ভীর আলোচনা । গোলগাল উলের গোলা পায়ের কাছে গড়াতে গড়াতে একটু দুরে চলে গেলে দৌড়ে গিয়ে কুড়িয়ে আনতাম আর কেমন যেন মায়া হত, আহা, কালকেও গোলাটা কত বড় ছিল, আজ কেমন ছোট হয়ে গেছে ! দেখতে দেখতে উলের গুটি থেকে বেরিয়ে আসত হাতে বোনা রঙবেরঙের সোয়েটার, কোনোটায় বিচিত্র রঙের নকশা করা, কোনোটায় একরঙের ওপর জটিল বুননে ফুটিয়ে তোলা কারুকার্য, এটা হাতকাটা তো ওটা পুরোহাতের । সারা শীতকাল জুড়ে সেইসব সোয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মা-পিসীমার আঙুলের স্পর্শ একটা অদ্ভুত আনন্দ আর প্রছন্ন গর্ব টইটম্বুর করে ভরে রাখত আমাদের মন । সোয়েটারের এই 'ডিজাইন' নিয়ে আবার চলত এক অদৃশ্য অথচ টানটান প্রতিযোগিতা, কে কত নতুন ডিজাইনের সংগ্রহ দেখাতে পারে ! আবার যদি কারুর কাছে নতুন একটা 'ডিজাইন' এল তো কিভাবে সেটা জোগাড় করা যায়, সেও এক উদ্বেগের ব্যাপার । কেউ ভারী উদার , চাইলেই যে কোনো ডিজাইন দিয়ে দেয় নির্দ্বিধায়, কেউ আবার ভীষণ কৃপণ, দেব দেব বলে কিন্তু দেয় না । শুধু ডিজাইনের জন্যই কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা বা কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া, ডিজাইনের বিনিময়ে ডিজাইন সবরকম ব্যাপারই চলতে দেখা যেত । ট্রেনে-বাসে নতুন কোনো ডিজাইন চোখে পড়লে শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে সেটা আয়ত্ত করার চেষ্টা এবং শেষ পর্যায়ে গিয়ে মরিয়া হয়ে সোয়েটারটি কিছুক্ষণের জন্য খুলে দিতে অনুরোধ করাও আশ্চর্য্য কিছু ছিল না । স্বয়ং আমার বড়পিসীমাকেই আমি এই পর্যন্ত এগোতে দেখেছি।

শীতের কথা বলতে গিয়ে প্রায় সোয়েটারের গল্প বলতে শুরু করেছি। কারণ সোয়েটার বাদ দিলে শীতকালে কিছু অদ্ভুত পোষাক আমদানী হত, যাদের জন্য আমাদের জীবন কখোনো দুর্বিষহ হয়েও উঠত। যেমন, সুন্দর ফ্রকের সঙ্গে পরিয়ে দেওয়া হল যেমন তেমন একটা সালোয়ার (তখন সালোয়ার কামিজ ব্যাপারটা তেমন চালু হয় নি)। মাথায় রঙিন রেশমী রুমাল পর্যন্ত ঠিক ছিল, কিন্তু তাতে খুশী না হয়ে মা জোর করে বেঁধে দিলেন একটা কুটকুটে মাফলার কিম্বা একটা বাঁদুরে টুপী । মানে কোনো 'ড্রেস কোড'-এর

বালাই নেই ! এই 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা'র বিরুদ্ধে আমরা যে গর্জে উঠতাম না তা নয়, তবে আমাদের ওপর ওয়ালারা সেই চি চি গর্জনে কান দেওয়ার লোক ছিলেন না মোটেই । তাই লাভ কিছুই হত না । তবে এটুকু বাদ দিলে ছোটবেলায় শীতের অজস্র মজার মধ্যে আসল ব্যাপারটা ছিল ছুটি । নভেম্বরের মাঝামাঝি, মানে পুজোর ছুটির পর ইস্কুল খুললেই বার্ষিক পরীক্ষাটা হয়ে যেত শীতের শুরুতেই । তার আগে কয়েকটা দিন যা একটু কষ্ট, গল্পের বই টই গুলো বাদ দেওয়া, একটু বেশী পড়াশোনা, বকাঝকা । তবে সে আর ক'দিন ? কোনোভাবে পরীক্ষাটা শেষ হয়ে গেল তো ব্যস তার আর পর নেই ! তখন সকালে উঠে ঠিক পড়তে বসার মতো নিয়ম করে কিছুক্ষণ জমিয়ে রাখা গল্পের বইগুলো পড়া। আর তারপর সারাদিন বিভিন্ন পর্যায়ে শুধু খেলা খেলা আর খেলা। কেউ বড়ো একটা বারণও করত না।

আমার ছোটবেলার সম্পদ ছিল টুকটুকে লাল মেঝেওয়ালা একটা চওড়া 'দক্ষিণের বারান্দা' আর একটা বিশাল বাগান, যেটাকে এখনও আমার প্রায় 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' বলে মনে হয় । শীতকালে আমাদের সারাদিন কেটে যেত ঐ বারান্দায় আর বাগানে অসংখ্য জিনিসের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে । সকালে ঘুম থেকে উঠে গায়ে গরম জামা চড়িয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম বাগানে, সেখানে তখোনো গাছের পাতায় পাতায় শিশিরের আলপনা, ঘাসের ওপর নরম রোদ্দুর পড়ে ঝিকমিকিয়ে ওঠা শিশিরবিন্দু। মনে মনে সহজ পাঠের সহজ কথার সঙ্গে মিলিয়ে নিলাম, 'সকালবেলায় ঘাসের আগায় শিশিরের রেখা ধরে', অথবা 'ঘাস ভিজে, পা ভিজে যায়'। বড়ো বড়ো গাছগুলো, আম, পেয়ারা, বকুল, বাতাবি আর পাতিলেবুর ঝাড়, বেলফুল, জুঁই, মাধবীলতা, কামিনী - শীতকালে এদের কোনো কাজ নেই, চুপচাপ দেখে যাওয়া ছাড়া। স্থলপদ্মের কুঁড়ি ছোট হতে হতে থেমে গেছে, শিউলিও তাই। শুধু জবা গাছের দু-চারটে ছোট খাটো ফুলের পাশে আলো হয়ে ফুটে আছে নানারকমের অজস্র গাঁদা । কোনোটাকে দেখলে ঠিক কমলা লেবু বলে মনে হচ্ছে, কোনোটার রঙ উজ্জ্বল সোনালী, একপাটি গাঁদাগুলো ঠিক যেন গাছভরা হলুদ তারা ফুটে আছে । তার পাশাপাশি একের পর এক চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়, রঙবেরঙের । ওদের দেখলে আমার কেমন মনে হত বিভিন্ন ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা যেন নিজের ইউরিফর্ম পরে দলে দলে হাজির হয়েছে । বড়ো হয়ে যখন জেনেছিলাম ওদের নাম 'পমপম', ভারী খুশী হয়েছিলাম, কি মানানসই নাম, না ? প্রত্যেকবছর শীতকালে বাগানের একটা গোল জায়গা কাঠি দিয়ে ঘিরে তার মধ্যে তৈরী হতো আমাদের ভাইবোনেদের নিজস্ব বাগান। সেখানে মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হতো গোটাকয়েক ছোলা-মটরদানা, কিছু সরষে আর ধনে। কিছুদিনের মধ্যেই সেইসব দানা থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে আস্তে আস্তে ডালপালা ছড়িয়ে উঠে দাঁড়াত । আবার মনে মনে মিলিয়ে নিতাম সদ্য পড়া বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের পাঠের সঙ্গে । সকালে উঠে দৌড়ে যেতাম সেই একান্ত নিজস্ব বাগানে, নিজের সম্ভবতঃ প্রথম সৃষ্টির তদারকিতে । কত বিচক্ষণতার সঙ্গে ছোলা-মটর, সর্ষে আর ধনেকে নির্বাচন করা হয়েছিল সেটা ভেবে এখন নিজেরই খুব অবাক লাগে, আমাদের উৎসাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠতে এদের কোনো তুলনা নেই । যখন শীতটা ঠিক জমিয়ে পড়ত তখন গাছভরা টম্যাটো, লতানো গাছে ঝুলে থাকা শিম-বরবটি আর বাগানভরা ফুলের পাশে আমাদের বাগানে উজ্জ্বল হলুদ রঙের ছিপছিপে সুন্দরী সর্ষেফুল হাওয়ায় মাথা দোলাত, ছোট্ট সাদা ফুলকে বাঁচিয়ে রান্নাঘরে চলে যেত দুচারটি ধনেপাতা আর লতিয়ে চলা ছোলা-মটর গাছের সাদা-বেগুনী ফুল মুখ বার করত নড়বড়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমরা গর্বের হাসি হাসতাম, আর অবাক হয়ে দেখতাম কথা বললেই মুখ দিয়ে কেমন ধোঁয়া বেরোচ্ছে !

একটু বেলা হলে কাছে কোথাও খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী হতো, বাতাসে মিশে যেত একটা মিষ্টি মাদক গন্ধ। আমার শীতকালের স্মৃতির সঙ্গে ঐ গন্ধটা পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। বাজারের থলি উপুড় করা হলে তার পাশে বসে মুগ্ধ হয়ে দেখতাম গুলি গুলি নতুন আলুর শরীরে পাতলা খোসা, ফুলকপির প্রফুল্ল মুখ, বেগুনের চকচকে নিটোল শরীরে আশ্চর্য রঙ, টম্যাটোর টুকটুকে রূপ । রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে স্নান করতে করতে উত্তরে হাওয়ায় হি হি করে কেঁপে উঠতাম আর রীতিমতো হাঁ করে দেখতাম ভেজা শরীর আর ভেজা কাপড় থেকে কেমন ধোঁয়া উঠছে । যে দক্ষিণের বারান্দায় গরমের দীর্ঘ দুপুরে ছায়া ঘন হয়ে থাকত, শীতের সংক্ষিপ্ত দুপুরে সেই বারান্দায় বিছিয়ে যেত সোনারঙের রোদ্দুর । কোথাও থেকে ভেসে আসত রেডিওতে ক্রিকেটের ধারাবিবরণ । আমার গরমের ছুটির দুপুর মানে যদি অঙ্ক করা কিম্বা রচনা লেখা হয়, শীতের দুপুর মানে হল টিনটিন-শঙ্কু-ফেলুদা-অপু আরো অসংখ্য বন্ধুর সঙ্গে দুরন্ত অভিযান । তারপর পড়ন্ত বেলায় নানাবয়সী সাথীদের সঙ্গে মিলে এইসব অভিজ্ঞতা আর পরিকল্পনা ভাগ করে নিতে ঝুপ করে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ।

আমাদের শহরের এক প্রান্তে একটা বড়ো মাঠে প্রায় গোটা শীতকাল জুড়ে যাত্রাভিনয় হতো । সারাদিন ধরে শুনতে পেতাম রিক্সায় মাইক লাগিয়ে ঘুরে ঘুরে তার ঘোষণা চলছে । সন্ধের সময় সেই ঘোষণার ধাক্কায় প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত ; চারদিক থেকে নানা সুরে কানে আসছে 'আর মাত্র কিছুক্ষণ পর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে .....', সেইসব পালার নাম কখোনো 'গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম', কখোনো 'ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ', এইরকম ! মোটামুটি ছ'টার পর সেই চিৎকার থেমে গেলে চারদিক একেবারে চুপচাপ হয়ে যেত ! শীতকালের সেই সন্ধেবেলা দেখতেও ছিল অন্যরকম, বন্ধ দরজা-জানালের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে আসা আলোর আভায় আর ধোঁয়াটে অন্ধকারে কেমন যেন এক অদ্ভুতুড়ে পরিবেশ ! রাত আটটা মানে যেন অনেক রাত । আর একটু বেশী রাতে চারপাশ আরো শুনশান হয়ে গেলে অনেক দুর থেকে শোনা যেত যাত্রার বাজনা, গানের কলি, টুকরো কথোপকথন, অথবা পরিচিত কোনো বাঙলা গানের কলি 'সুরের আকাশে তুমি যে গো ধ্রুবতারা' কিম্বা 'তুমি যে আমার.....'। কখোনো জ্যোৎস্নাময় রাত্তিরে বারান্দার বেরিয়ে এলে দেখতাম কেমন বিষণ্ন আলো ছড়িয়ে আছে দিকবিদিকে, যাতে মন খারাপ হয়ে যায় ! মোট কথা শীতকালের উজ্জ্বল রোদ, উজ্জ্বল কমলালেবু, চন্দ্রমল্লিকা-ডালিয়ার দিনের মতো উজ্জ্বল ছিল না শীতের রাত !

সেই শৈশবে আমার জগৎটা ছিল বইয়ের পাতা জুড়ে । সে শুধু গল্পের বই বা বাইরের বই নয়, অনেক পাঠ্যবইও জড়িয়ে ছিল জীবনের সঙ্গে । বিশেষ করে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে বাঙলা বইটা পড়তাম, মানে সহজ পাঠ থেকে শুরু করে তখনকার 'কিশলয়', তার পাতাগুলো সত্যি হয়ে উঠত রোজকার জীবনে । সেখানে কালো রাতি যেভাবে ঘুচে যায়, যেভাবে কালকের খালি ডাল আজ ফুলে ভরে ওঠে, যেভাবে উনুনে বসানো জল গরম হয়ে ওঠে বা শিশির, কুয়াশা, মেঘ ও বৃষ্টি আসা-যাওয়া করে, সব আমি মিলিয়ে নিই আমার জীবনের সঙ্গে আর নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি । শুধু যেদিন পড়লাম এস্কিমোদের কথা, উত্তরমেরুর ছ'মাস দিন আর ছ'মাস রাতের গল্প, বরফের মেঝের ওপর বরফের চাঁই বসিয়ে তৈরী 'ইগ্লু' আর সর্বোপরি 'অরোরা বোরিয়ালিস'-এর কথা, বাঙলায় যার মিষ্টি নাম 'মেরুজ্যোতি', সেদিন আর বইয়ের পাতা মিলল না আমার নিজের জীবনের পাতার সঙ্গে। তখন চতুর্থ শ্রেণী ; রাক্ষস-খোক্কস-দত্যি-দানোদের পেরিয়ে এই প্রথম একটা শুধু ভাবনার জগৎ তৈরী হল একটা সত্যিকারের জিনিসকে ঘিরে । সেই কল্পনার জগতে না-দেখা মেরুজ্যোতির আশ্চর্য আলোয় চারদিক রহস্যময় হয়ে থাকে, রানধনুর সাতরঙের পাড় একের পর এক বসতে থাকে আবছা আলোর চাদরের নীচে । রোজ রাত্তিরে যখন আমাদের তাড়াতাড়ি খাইয়ে বিছানায় পাঠিয়ে দেওয়া হতো, তখন আধো অন্ধকার ঘরে লেপের নীচে আমার কল্পনার সুমেরু সত্যি হয়ে উঠত । প্রায় মাথা পর্যন্ত ঢেকে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে ভাইবোনেদের রোজই বইয়ে পড়া গ্রীনল্যান্ড-এস্কিমো-ইগ্লু-শীল-স্লেজ আর অরোরা বোরিয়ালিসের গল্প শোনাতাম । একই গল্প রোজ বলতে বা শুনতে কারুরই তেমন আপত্তি দেখা যেত না । এইভাবে আমার নিজস্ব শীতের রাতের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত সেই কল্পলোকের আশ্চর্য শীতকাল ।

এইসবের মধ্যে দিয়ে একদিন বড়ো হয়ে গেলাম । শৈশব শেষ হওয়া দিনে আস্তে আস্তে শীত আর বসন্তের সঙ্গে কান্না ও হাসির যে তুলনা করা হয়, তার তাৎপর্য্যও বুঝে গেলাম সঠিকভাবে । এমনকি যে দেশে সত্যিই শীত অন্ধকার, বিরক্তি আর মনখারাপের ঋতু আর বসন্ত আনন্দের সময়, সেই দেশের সঙ্গেও পরিচয় হল। কিন্তু সেটাও শেষ নয় । আজ আবার নতুন করে অনুভব করি ছোটবেলায় পড়া সেই সুন্দর কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয় । শীতের পরে বসন্ত আসে ঠিকই কিন্তু জীবনে বসন্তদিন যত রঙিনই হোক তাতে সঙ্গোপনে ছায়া ফেলে যায় বিগত শৈত্যদিনের রিক্ততার স্মৃতি, যাকে কখোনোই ঝেড়ে ফেলা যায় না। দিন যায়, অন্ধকারই শুধু সত্যি হয়ে থাকে, আড়ালে রয়ে যায় 'অরোরা বোরিয়ালিস'।